কালের কণ্ঠ

চমকানো তথ্য দিলেন রাষ্ট্রপতি

কালের কণ্ঠকে একান্ত সাক্ষাৎকার

“সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলাম আমি

এ যেন এক প্রাসাদবন্দি রাষ্ট্রপতির রোমহর্ষক গল্প। টানা দেড় বছরের সেই বন্দিদশা আর নেই। আর সেই স্বস্তিতেই রুদ্ধকালের ঘটনাপঞ্জি প্রাণখুলে তুলে ধরলেন রাষ্ট্রপ্রধান **মো. সাহাবুদ্দিন**। গত শুক্রবার রাতে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে তাঁর একান্ত সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন কালের কণ্ঠের নির্বাহী সম্পাদক **হায়দার আলী** ও বিশেষ প্রতিনিধি **জয়নাল আবেদীন**

হায়দার আলী : আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন মহামান্য?
রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন : সপ্তাহখানেক ধরে ভালো আছি বেশ।
হায়দার আলী : তার আগে ভালো ছিলেন না?
(রাষ্ট্রপতির মুখে রহস্যের হাসি)
হায়দার আলী : অন্তর্বর্তী সরকারের দেড় বছর বঙ্গভবনে আপনার কেমন কেটেছে?
রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন : (কিছুক্ষণ নীরব থেকে, তারপর একটা দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে) ওই দেড় বছর আমি কোনো আলোচনায় নেই অথচ আমাকে নিয়ে চলে নানা চক্রান্ত।
কালের কণ্ঠ : একটু যদি বিস্তারিত বলেন।
রাষ্ট্রপতি : দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা চিরতরে ধ্বংস করার এবং সাংবিধানিক শূন্যতা সৃষ্টি করার অনেক পাঁয়তারা হয়েছে। (এটুকু বলে মহামান্য নীরব)।
কালের কণ্ঠ : সেসব কি সফল হয়েছে?
রাষ্ট্রপতি : আমি দৃঢ়চিত্তে আমার সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলাম। যে কারণে কোনো ষড়যন্ত্রই সফল হয়নি। বিশেষ করে অসাংবিধানিক উপায়ে রাষ্ট্রপতিকে উপড়ে ফেলার অসংখ্য ছক ব্যর্থ হয়েছে। ফলে দেড় বছর বঙ্গভবনের অভিজ্ঞতা যে ভালো, তা বলা যাবে না। আমার ওপর দিয়ে যে ঝড় গেছে, এ রকম ঝড় সহ্য করার মতো ক্ষমতা অন্য কারো ছিল কি না আমি জানি না।
কালের কণ্ঠ : আপনার পদত্যাগ দাবিতে বিক্ষোভ হতে দেখেছি। বঙ্গভবন অভিমুখে মিছিল হয়েছে, আন্দোলন হয়েছে। সে পরিস্থিতিতে বঙ্গভবনের ভেতরের পরিবেশ কেমন ছিল? আপনার ভাবনা কী ছিল?
রাষ্ট্রপতি : আমাকে কতভাবে উপড়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে! কোনো পরিস্থিতিতেই আমি ভেঙে পড়িনি। আমি বলেছি, আমার রক্ত ঝরে যাবে বঙ্গভবনে। রক্ত ঝরে ঝরুক। আরেক ইতিহাসে আমি যোগ হব। কিন্তু আমি সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করব—আমি এই সিদ্ধান্তেই অবিচল ছিলাম। আল্লাহর ইচ্ছা আর আমার দৃঢ়তা।

দেড় বছরে আমাকে উপড়ে ফেলার অনেক চক্রান্ত হয়েছে, সংকটের কঠিন মুহূর্তে আমাকে সমর্থন দিয়েছে বিএনপি জোট ও সশস্ত্র বাহিনী

রাষ্ট্রপতি একটি দেশকে প্রতিনিধিত্ব করেন, অথচ হাইকমিশনগুলো থেকে রাতারাতি রাষ্ট্রপতির ছবি নামানোর মতো ঔদ্ধত্য দেখায় একজন উপদেষ্টা

বঙ্গভবনে বিক্ষোভ চলাকালে নাহিদ ইসলাম আমাকে ফোনে বলেছিল, 'ওরা আমাদের লোক না'

আমার বিদেশ সফরেও বাধা দেয় বিগত সরকার, আমার নামে চিঠি বানিয়ে বিদেশে আমাকে হেয় করার চেষ্টা করে

অন্তর্বর্তী সরকারের কাছ থেকে বারবার অপমানের শিকার হয়েছি। রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আমাকে অন্ধকারে রেখে সংবিধানের নীতিবিরুদ্ধ আচরণ করেছে অন্তর্বর্তী সরকার

সাংবাদিকদের সৌজন্য সাক্ষাতের জের ধরে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিবের আক্রোশের শিকার হয় বঙ্গভবনের প্রেস উইং, পুরো উইং তুলে নিয়ে খোঁড়া করে দেয়, ৩০ বছর ধরে কর্মরত দুজন ফটোগ্রাফারকেও প্রত্যাহার করে নেয়

কালের কণ্ঠ : কে বা কাদের নেতৃত্বে ওই আন্দোলন হয়েছিল? কেনই বা আপনার প্রতি এত আক্রোশ ছিল তাদের?
রাষ্ট্রপতি : ২২ অক্টোবর ২০২৪, বঙ্গভবন ঘেরাও হলো। অমুকের দল, তমুকের দল, মঞ্চ, ঐক্য—কত কী! রাতারাতি সৃষ্টি! এগুলো একই টাইপের লোকজন সব বিভিন্ন ফোরামে, বিভিন্ন নামে। কোথায় তারা এত টাকা পেল?

এখানে যখন ঘেরাও করল, সেনাবাহিনীর নবম ডিভিশন থেকে ফোর্স এসে তিন স্তরে নিরাপত্তা দিল। তারপর ওই যে মেয়েটা, লাফ দিয়ে কাঁটাতারের বেড়ার ওপরে উঠে ঝাঁপ দেয়। কী আশ্চর্যের ব্যাপার! এগুলো ভাড়াটিয়া। তারপর যখন সাউন্ড গ্রেনেড মারা হলো, লাফ দিয়ে পড়ল। পড়ার পর সে পড়েই থাকবে, ছবি তোলা হবে। সে ডাকছে ক্যামেরাম্যানকে যে ছবি তোলো, ছবি তোলো। মানে এটা দিয়ে সে ব্ল্যাকমেইল করবে। তারপর তাকে মহিলা পুলিশ দিয়ে আর মহিলা আর্মি দিয়ে টেনেহিঁচড়ে তুলে আর্মির জিপে করে নিয়ে যায়।

ওই রাতটা আমার জন্য ছিল বিভীষিকাময়। এই যে ফ্লাইওভার, এই ফ্লাইওভার দিয়ে ওই পেছনে, ওদিকে খালি ঠেলাগাড়ি, ভ্যান, কাভার্ড ভ্যান দিয়ে চারদিকে ছিন্নমূল লোকজন আসে। গণভবনের মতো বঙ্গভবনও লুট করতে চেয়েছিল। আমরা তো ঘরেই ছিলাম। আমাদের তো আর কিছু নেই, এখান থেকে তো আমি পালাব না, তাই না? সেই অবস্থা যদি হতো, তখন একটা কথা ছিল। তিন স্তরের নিরাপত্তা দিয়ে কভার করা হয়েছে। সেনাবাহিনী খুব দৃঢ়তার সঙ্গে, আবার এপিসি দিয়ে ঠেলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়।
রাত ১২টার সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা তখনকার তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম ফোন করল, 'এ রকম একটা খবর পাওয়া গেছে, ওরা আমাদের লোক না। আমি এ বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলেছি। এগুলো সব আমরা ডিসপার্স করার চেষ্টা করছি।'

তারপর দেখি, হ্যাঁ, কিছু স্থানীয় লোক এসে ওদের নিয়ে যায়। কিন্তু কিছু লোক আবার থেকে যায়। তাদের সরাতে রাত ২টা বেজেছে। রাত ২টা-৩টা পর্যন্ত আমরা তো জেগে আছি। কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় তারা মিটিং করছে- রাষ্ট্রপতির অপসারণ চাই, রাষ্ট্রপতির অপসারণ চাই। রাজু ভাস্কর্যের ওখানে, তারপর বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন ছোট ছোট গ্রুপ করে তারা এটা চায়।

কালের কণ্ঠ : সেই দুঃসময়ে কাউকে পাশে পেয়েছিলেন?
রাষ্ট্রপতি : আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, ওই কঠিন সময়েও বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্ব আমার পাশে ছিলেন। তাঁরা তখনো সংবিধানের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখার বিষয়টি আমার কাছে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। বিশেষ করে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ঘিরে আমার মনের মধ্যে অনেক কৌতূহল জমা ছিল। কিন্তু আমি পর্যায়ক্রমে বুঝতে পারলাম, তিনি খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ মানুষ। হি ওয়াজ সো কর্ডিয়াল! আমার দুঃসময়ে বিএনপির সহযোগিতা শতভাগ ছিল।
কালের কণ্ঠ : অন্তর্বর্তী সরকারের ভেতর থেকে রাষ্ট্রপতি অপসারণের উদ্যোগ কেন নেওয়া হয়েছিল, আর কারা এর ইন্ধন জুগিয়েছিল বলে মনে করেন?
রাষ্ট্রপতি : মূলত গণ-অভ্যুত্থানের কিছু নেতার চাপে আমাকে অপসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করে একটি সিদ্ধান্তে আসে। এমনকি অন্তর্বর্তী সরকারও একটা সিদ্ধান্তে এসেছিল। সেটা হলো, যদি রাজনৈতিক দলগুলো চায় আমি অপসারিত হই, তাহলেই শুধু আমি অপসারিত হতে পারি; নচেত্ নয়। পরে দেখা গেল যে এই ইস্যুতে দুটি গ্রুপ হয়ে গেল। গ্রুপে গ্রুপে মিটিং হলো, আলোচনা হলো। তারা বিভিন্ন দল ও জোটের কাছে গেল। তখন এ রকম একটা অবস্থা ছিল—যেকোনো মুহূর্তে মেজরিটি হয়ে গেলেই আমি অপসারিত হয়ে যাব বা আমার মনস্তাত্ত্বিক দিক ভেঙে যাবে। তখন তারা আমাকে অনুরোধ করবে পদত্যাগের জন্য।

কিন্তু বিএনপি থেকে উচ্চপদে আসীন নেতা আমাকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন যে, 'আপনার প্রতি আমাদের সমর্থন আছে। আমরা সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখতে চাই। কোনো অসাংবিধানিক উপায়ে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের পক্ষে আমরা নই।
আমি বলব যে বিএনপি ও তাদের জোটসঙ্গীরা একটা গ্রুপ হয়ে যায়। আর আরেকটা গ্রুপ হয়ে যায়, তাদের আপনারা সবাই চেনেন। তবে তারা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। উদ্যোগটা ব্যর্থ হলো বিএনপি ও তাদের জোটের কারণে। একটা বৃহত্তর রাজনৈতিক দল যে স্ট্যান্ডটা নিয়েছে, সেটাকে সরকার তখন সমর্থন করতে বাধ্য হলো।

ওটা সবচেয়ে বড় মুভ ছিল আমাকে অপসারণ করার। মানে, তারা এত বেশি চ্যালেঞ্জিং ভাবনার মধ্যে ছিল যে একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বে। যার ফলে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বসা, কথা বলা—এসব সযত্নে তারা করেছে। এই আলাপটাকে তারা ইতিবাচক দিকে নিয়ে যেতে পারবে—সেই বিশ্বাসটা তাদের মধ্যে ছিল। যার ফলে তারা বিভিন্নভাবে প্রতিদিন টাইম দিয়ে, সময় করে বিভিন্ন দলের কাছে যাওয়া, তাদের সঙ্গে কথা বলা, বের হয়ে এসে সাংবাদিকদের ফেস করা; এই সব কাজই কিন্তু হয়ে গেছে এর মধ্যে। আমিও অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে লক্ষ করছি—দেখা যাক না, কী হয়! একসময় দেখা গেল যে আপনা-আপনিই এটা নীরব হয়ে গেল; আর এগোতে পারল না। তাতে বোঝা গেল যে এটা হবে না।
কালের কণ্ঠ : এরপর নতুন করে আর কোনো উদ্যোগ ছিল আপনার বিষয়ে?
রাষ্ট্রপতি : হ্যাঁ, বলতে গেলে শেষ সময় পর্যন্ত তারা চেষ্টা করে গেছে—কিভাবে আমাকে উপড়ে ফেলা যায়। রাজনৈতিক পর্যায় থেকে ওই উদ্যোগটা ব্যর্থ হলে খোদ অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকেই নতুন করে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। আজকে বলতে দ্বিধা নেই যে একটা অসাংবিধানিক উপায়ে একজন সাবেক প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে এসে আমার জায়গায় বসানোর চক্রান্ত করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। এই মুভটা হয়েছে।

আমি বিষয়টি জেনেছি। সরকারের পক্ষ থেকে একজন উপদেষ্টা ওই বিচারপতির শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তাঁরা ঘণ্টাব্যাপী মিটিং করেন। তবে ওই বিচারপতি রাজি হননি। উনি সাফ বলে দিয়েছিলেন, 'উনি রাষ্ট্রপতি, উনি সবার ঊর্ধ্বে সাংবিধানিকভাবে, সবকিছুর ওপরে। ওই জায়গায় আমি অসাংবিধানিকভাবে বসতে পারি না।' ওই বিচারপতির দৃঢ়তার কারণে শেষ পর্যন্ত সরকারের ওই উদ্যোগও ব্যর্থ হয়।

কালের কণ্ঠ : আপনি কিভাবে বিষয়গুলো জানতে পারলেন?
রাষ্ট্রপতি : আমি তো বিচার বিভাগের লোক। বিচার বিভাগ তো উনার আশপাশে আছে সব। আমি সেভাবেই বিষয়টি জেনে যাই।
কালের কণ্ঠ : আপনার সেই দৃঢ় মনোবলের নেপথ্যে কী ছিল? কেউ কি আপনাকে সাহস জুগিয়েছিল?
রাষ্ট্রপতি : সত্যি বলতে, একা আমার পক্ষে মনোবল ঠিক রাখা কঠিন হতো, যদি না অনেকের আশ্বাস বা অভয় বাণী না পেতাম। বিশেষ করে বিএনপির

সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে আমাকে এই বলে আশ্বস্ত করেছিল যে আমি যেন সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষায় অবিচল থাকি। কোনো অবৈধ উপায়ে রাষ্ট্রপতি অপসারণের পক্ষে তারা নয়।

এ ছাড়া তিন বাহিনীর পক্ষ থেকে আমাকে সর্বোচ্চ সমর্থন দিয়েছে। তারা শুধু একটা কথাই বলেছে, 'মহামান্য, আপনি হচ্ছেন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান। আপনার পরাজিত হওয়া মানে পুরো সশস্ত্র বাহিনীরই পরাজিত হওয়া। এটা আমরা যেকোনো মূল্যে রোধ করব।' শেষ পর্যন্ত তারা এটা করেছে। তারা বিভিন্ন সময় আমার কাছে এসে আমাকে মনোবল দিয়েছে। শুধু তাই নয়, অন্তর্বর্তী সরকারের ভেতর থেকে আরেকবার আমাকে অপসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল বলে শুনেছি। তখনো তিন বাহিনীর প্রধানরা আমার পক্ষে অবস্থান নেন। তাঁরা তাঁদের এই অভিমত অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানকেও গিয়ে জানান যে কোনো অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড তাঁরা হতে দেবেন না। বঙ্গভবনের সামনে যখন মব সৃষ্টি করা হয়, তখনো সশস্ত্র বাহিনী ওই অবস্থান নিয়েছিল।

গত শুক্রবার রাতে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে আলাপচারিতায় কালের কণ্ঠের বিশেষ প্রতিনিধি জয়নাল আবেদীন। ছবি : কালের কণ্ঠ

কালের কণ্ঠ : এ বিষয়ে আপনি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন কি? অথবা সেই দিক থেকে আপনার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ হয়েছিল কি?

রাষ্ট্রপতি : ওই পরিস্থিতিতে ড. ইউনূসের কাছ থেকে কোনো ফোন পাইনি। আমার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো অবস্থানেই তিনি ছিলেন না। অবশ্য উনাকেও আমি সাহায্য চেয়ে কোনো আবদার করিনি। আমার মনোভাব ছিল, যা হচ্ছে হতে থাকুক, দেখা যাক কতদূর গড়ায়। তবে আমি এটুকু বলতে পারি যে, কূটনৈতিক মহল থেকেও আমাকে অপসারণ করার বিষয়ে নেতিবাচক অবস্থান ছিল। আমি এভাবে অসাংবিধানিক ও বেআইনিভাবে অপসারিত হই, সেটা তারাও চায়নি। এটাও বড় শক্তি ছিল। তবে আমি সব সময় স্বীকার করি যে বিএনপি এবং তার জোট অন্যের প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হয়নি। তারা নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল ছিল।

কালের কণ্ঠ : রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রধান উপদেষ্টা আপনার সঙ্গে কোনো সমন্বয় করেছিলেন? আপনার কাছে তিনি কতবার এসেছিলেন? তাঁর আমলে ১৩৩টি অধ্যাদেশ জারি হয়েছে। সেগুলোর বিষয়ে আপনি অবগত ছিলেন বা আপনাকে জানানো হয়েছে?

রাষ্ট্রপতি : তখন যতগুলো অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে, সেগুলো হয়তো তৎকালীন সময়ের প্রয়োজনীয়তার জন্যই হয়েছে। তার পরও আমার দৃষ্টিতে মনে হয়েছে, অনেক অধ্যাদেশ করার কোনো কারণ ছিল না। প্রধান উপদেষ্টা সংবিধানের কোনো বিধান মেনে চলেননি। সংবিধানে বলা আছে, উনি যখনই বিদেশ সফরে যাবেন, সেখান থেকে ফিরে এসে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করবেন এবং আমাকে ওই আউটপুটটা জানাবেন। কী আলোচনা হলো, কী হলো, কোনো চুক্তি হলো কি না, কী ধরনের কথাবার্তা হলো, এটা আমাকে লিখিতভাবে অবহিত করার কথা। তো, উনি তো বোধহয় ১৪ থেকে ১৫ বার বিদেশ সফরে গেছেন। একবারও আমাকে জানান নাই। একবারও আমার কাছে আসেননি।

কালের কণ্ঠ : তার মানে নির্বাচনের আগে সর্বশেষ যে চুক্তিটি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে, সে বিষয়েও আপনি অবগত নন?

রাষ্ট্রপতি : না, কোনো কিছুই আমি জানি না। এ রকম রাষ্ট্রীয় একটা চুক্তি অবশ্যই আমাকে জানানো দরকার ছিল। এটা ছোটখাটো হোক আর বড় কিছু হোক, অবশ্যই পূর্ববর্তী সরকারপ্রধানরা রাষ্ট্রপতিকে জানিয়েছেন। আর এটি হলো সাংবিধানিক একটা বাধ্যবাধকতা। কিন্তু তিনি তো তা করেননি। মৌখিকভাবেও জানাননি, লিখিতভাবেও জানাননি। আসেনওনি। আর এমনিতেই তো উনার আসার কথা!

কালের কণ্ঠ : তার মানে, গত দেড় বছরে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আপনার স্বাভাবিক সম্পর্ক ছিল না? সমন্বয়ও ছিল না?

রাষ্ট্রপতি : উনি যে প্রধান উপদেষ্টা হলেন, সেই প্রক্রিয়ার উৎসই ছিলাম আমি। অর্থাত্, আমার উদ্যোগেই এই সরকার গঠনের প্রক্রিয়াটি শুরু হয়। কিন্তু প্রধান উপদেষ্টা পরবর্তী সময়ে আমার সঙ্গে সেভাবে সমন্বয় করেননি। এটি আসলে বোঝানোর কোনো উপায়ও নেই। কেননা তিনি একটিবারের জন্যও আমার কাছে আসেননি। আমাকে সম্পূর্ণভাবে আড়ালে রাখার চেষ্টা করে গেছেন। আমার দুইবার বিদেশ সফর উনি আটকে দিয়েছেন। একটা ছিল কসোভো। গত ডিসেম্বরের ঘটনা। সেখান থেকে রাষ্ট্রপতিকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল কি-নোট পেপার ওখানে একটা অ্যাসেম্বলিতে পড়ার জন্য। কিন্তু আমাকে যেতে দেওয়া হয়নি।

তারপর কাতারের আমির আমাকে দাওয়াত করল ওখানে একটা সামিটে অংশগ্রহণের জন্য। রাষ্ট্রপতি অ্যাড্রেস করবেন। সেই সেমিনারে রাষ্ট্রপতি ছাড়া আর কেউ থাকবে না। তখন আমার কাছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আমাকে একটি চিঠি দেওয়া হলো। চিঠিটি বানিয়ে দেওয়া হলো, তারাই ড্রাফট করল। ড্রাফট করে আমার কাছে পাঠায়। আর ওই দাওয়াতপত্রটাও পাঠায়। চিঠিটার মধ্যে ছিল যে, আমি রাষ্ট্রীয় কাজে ভীষণ ব্যস্ত। সুতরাং এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব না। আমি দুঃখিত। ওই চিঠিতে আমি যেন সই করে দিই।

কালের কণ্ঠ : এই চিঠিটা লেখার সময় আপনার সঙ্গে কোনো আলোচনা হয়েছে?

রাষ্ট্রপতি : না, সেটাই তো বলছি। আমার সঙ্গে কোনো পরামর্শ করা হয়নি, আমাকে জানানোও হয়নি। চিঠিটা দেওয়ার পর আমরা জানলাম যে, এ রকম একটা দাওয়াত এসেছিল।

কালের কণ্ঠ : আপনি কি সত্যিই রাষ্ট্রীয় জরুরি কাজে ব্যস্ত ছিলেন?
রাষ্ট্রপতি : (হেসে) একজন রাষ্ট্রপতি কি এত বেশি ব্যস্ত থাকে, আমাদের সংবিধানের আলোকে? যাই হোক, পরে আমি ওই চিঠিতে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে পাল্টা একটি চিঠি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠাই। তাতে আমি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এমন শিষ্টাচারবহির্ভূত ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের তীব্র নিন্দা জানাই। ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের অপরাধ না করা হয়, সে বিষয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টাকে চিঠি দিই। ওই চিঠির জবাবে তারা নিরুত্তর ছিল। তবে এরপর আর কোনো দেশ থেকে আমন্ত্রণ এসেছিল কি না, সে বিষয়ে জানার সুযোগও হয়নি।
কালের কণ্ঠ : কেন আপনাকে বিদেশ সফরে যেতে দেওয়া হয়নি বলে মনে করেন?
রাষ্ট্রপতি : মূলত ওই সরকার চায়নি কোথাও আমার নাম আসুক। আমাকে একদম অন্ধকারে ফেলে রাখার চেষ্টা করেছে। তারা চায়নি জনগণ আমাকে চিনুক, জানুক। এটি আমাকে খুবই কষ্ট দিয়েছে। শুধু বিদেশে নয়, দেশের কোনো অনুষ্ঠানেও আমাকে যেতে দেয়নি। বিশেষ করে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির যাওয়ার কথা। সেটিও তারা আটকে দেয়।
তারপর দেখেন, আরেকটি ঘটনা আমাকে অপমান করার জন্য। একদিন হঠাৎ করে কোনো একজন উপদেষ্টা বিদেশ ভ্রমণে গেছেন। সেখানে বাংলাদেশ হাইকমিশনে আমার ছবিটা লাগানো আছে। সারা বিশ্বে বাংলাদেশের কনস্যুলেট থেকে শুরু করে হাইকমিশন—সব জায়গায় রাষ্ট্রপতির ছবি থাকে। কারণ স্টেটকে রিপ্রেজেন্ট করে রাষ্ট্রপতি। এটা বছরের পর বছর ধরে চলে আসছে। কোনো একজন উপদেষ্টা তিনি বিদেশে গিয়ে আমার ছবিটা দেখেছেন। দেখে ওখানেই কনস্যুলেটের প্রধানকে গালিগালাজ করেছেন, এই ছবি এভাবে থাকবে কেন? তারপর এক রাতের মধ্যে সারা পৃথিবীর সব হাইকমিশন থেকে আমার ছবি নামিয়ে দেওয়া হলো। দীর্ঘদিনের একটা রেওয়াজ রাতারাতি শেষ করে দেওয়া হলো। ওই ঘটনাটি গণমাধ্যমে এলে আমি জানতে পারি। তখন আমার মনে হয়েছে যে এটি বোধহয় আমাকে অপসারণের প্রথম ধাপ। সুতরাং পরবর্তী ধাপে হয়তো আমাকে সরিয়ে দেবে। এ জন্য আমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

এ ছাড়া জনগণের মধ্যেও তো একটা বিরূপ বার্তা যায় যে উনাকে রাখা হচ্ছে না। এ ধরনের কাজও হয়েছে। তা-ও তো সহ্য করে, দৃঢ়তার সঙ্গে আমি থেকেছি, শুধু সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য।
কালের কণ্ঠ : ওই ঘটনায় কোনো প্রতিবাদ করেননি?
রাষ্ট্রপতি : আমি পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বরাবর একটি চিঠি দিয়েছিলাম। আমার মনের ক্ষোভ সেই চিঠির মধ্যে বর্ণনা করেছি। তো, ওই চিঠি পেয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা একটু চুপচাপ। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে বলছে, এটা অনেক বড় বিষয়। আমি এ বিষয়ে আর কথা বলতে চাই না। নীরব ছিল।
কালের কণ্ঠ : আর কোনো ঘটনার কথা বলবেন?
রাষ্ট্রপতি : একবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নির্বাচনে জেতার পর পুরো কমিটির সদস্যরা আমার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এলেন। আমি সাংবাদিকবান্ধব মানুষ হিসেবে তাঁদের সঙ্গে দেখা করি। খুবই সাধারণ একটা সাক্ষাৎ ছিল। আমাদের মধ্যে সামান্য কথাবার্তা হয়েছিল, তারপর ফটোসেশন হয়। ওই ঘটনা পরদিন কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশ হলে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং তা স্বাভাবিকভাবে নেয়নি। জোর করে উনারা খুঁজতে থাকল যে বঙ্গভবনের প্রেস উইংয়ের কে এই কাজটা করেছে। আসলে প্রেস উইংয়ের কেউ তো এই কাজ করেনি। আমি নিজেই সাংবাদিকদের চিঠি পেয়ে তাঁদের আসতে বলেছিলাম। কিন্তু তাঁরা অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে তিনটা মানুষকে এখান থেকে অপসারণ করে নিয়ে গেল। প্রেস সেক্রেটারি, ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রেস সেক্রেটারি—তিনজনকেই নিয়ে গেল। পুরো উইংটাই প্রত্যাহার করে নিয়ে গেল।
কালের কণ্ঠ : আপনার এখন কোনো প্রেস উইং নেই?
রাষ্ট্রপতি : না। তিনজনকেই নিয়ে গেছে। এমনকি দুজন ফটোগ্রাফার ছিল, যারা ৩০ বছর এখানে কাজ করছিল ফটোগ্রাফার হিসেবে, তাদেরও প্রত্যাহার করে নিয়ে গেল। প্রেস উইং একদম নিল করে দিল। আমরা এখান থেকে কোনো প্রেস রিলিজ দিতে পারি না। বাংলাদেশের ক্রিকেট টিম কোথাও জিতলে অভিনন্দন জানিয়ে যে একটা প্রেস রিলিজ দেব, সেটাও পারি না। একদম প্রতিবন্ধী করে দিল। আমি রাষ্ট্রপতি হয়ে নিজে ক্যাবিনেট সেক্রেটারিকে বারবার ফোন করেছি, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে ফোন করেছি, এস্টাবলিশমেন্ট সেক্রেটারিকে ফোন করেছি। কেউই পাত্তা দেয়নি।

এসব করা হয়েছে বাংলাদেশের জনগণের কাছে আমার এক্সপোজারটা বন্ধ করার জন্য। এই যে দেশের বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলোতে রাষ্ট্রীয় ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়, সেখানে রাষ্ট্রপতির ছবি ও বাণী দেওয়া বন্ধ করে দেয় অন্তর্বর্তী সরকার। ক্রোড়পত্র ঠিকই প্রকাশিত হয়। তাতে আমার বাণী দেয় না। আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখেন, গত দেড় বছরে আমার কোনো বাণী গেছে কি না। আগামীকালই (শনিবার) ইনশাআল্লাহ একুশে ফেব্রুয়ারিতে হয়তো আমার বাণী আসবে।